প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৩৬৭

প্রকাশক
অমরনাথ দে
গোল্ডেন বুকস অব ইণ্ডিয়া (পাবলিকেশনস্)
৩২/১, চণ্ডী ঘোষ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৪০

প্রচ্ছদপট
বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক
রবীন্দ্রনাথ সিংহ
পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স
৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩
কথা ও কাহিনী
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মায়ের স্মরণে

কয়েকটি কথা

প্রচলিত অর্থে 'ভূমিকা' বলতে যা বোঝায় এ ছত্র ক'টি ঠিক তা' নয়। কারণ, অনেকের মতো আমারও বিশ্বাস যে কবিতাই কবিতার ভূমিকা, গ্রন্থারম্ভ ও গ্রন্থশেষ। নচেৎ রসহানির আশঙ্কা থাকে, তা' ছাড়া অহেতুক পাঠককে প্রভাবিত করবার একটা প্রবণতা লেখকের মধ্যে এসে যায়।

তবু কয়েকটি ছত্র লিখতে হচ্ছে। কিছুটা কৈফিয়ৎ হিসেবে। আটায় পা দিয়ে যদি কেউ তার প্রথম কবিতার বই প্রকাশে উদ্যোগী হয়, তা' হলে একটা কৈফিয়তের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার কবিতা কিছুটা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হ'চ্ছে চল্লিশ বছর ধরে—১৩৪৯ সনে প্রকাশিত একটি কবিতার মুদ্রিত কপি সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া গেছে, তারও অন্ততঃ দু তিন বছর আগে থেকে যে রচনায় অভ্যাস করছিলাম—এটা ধরে নেওয়া অসঙ্গত হবে না। বলাইবাহুল্য, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে গ্রন্থাকারে কিছু কবিতা প্রকাশের ইচ্ছে অনেক সময়ই হয়েছে। তারপর নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। এবার অনেক বিলম্বে, হলেও ব্যাপারটা যে সত্যি ঘটলো, তার কারণ নিজের আগ্রহ ততোটা নয় যতোটা কাব্য-রসিক কিছু বন্ধুজন তথা আমার দুই মেয়ের (মানবী ও চন্দ্রাবলী)। এদের সকলেরই অভিযোগ : আমার অনেক রকম বই আছে, আর এতো দীর্ঘ কাল ধরে কবিতা অভ্যাস করছি, অথচ আমার এক খানা কবিতার বই থাকবে না—এটা হতে পারে না।

তবে হাঁা, এ সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা তৃপ্তির ব্যাপার আছে। তা' হলো গত বিশ বাইশ বছর ধরে একটি কবিতা লিখবো লিখবো ভাবছিলাম—এই উপলক্ষে সেটিও (হাজার বছরের স্বপ্ন) লেখা হয়ে গেলো। সাজানোর ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এই কবিতাটি প্রথমে দেওয়া হয়েছে—বাদবাকী অন্য সব রচনা প্রথম প্রকাশ বা রচনাকাল অনুযায়ী পর পর সাজানো হয়েছে।

সুনীল কুমার নাগ

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সাহিত্য-সমালোচনা ঃ

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সঙ্গম

উপন্যাস ঃ

মনের আলোয় দেখা

প্রেম নিরন্তর

সম্পাদনায় ঃ

Popular Festivals of India

Indian Poetry for All Occasions

সূচীপত্র

হাজার বছরের স্বপ্ন

সমীক্ষা

১

হাজার বছর দেখেছি স্বপন
কতো রঙে জাল করেছি বপন,
কখনো বুঝেছি, বুঝিনি কখনো
কি যে তার ঠিক অর্থ ;
স্মৃতির সরণি ক্ষীণ আঁকাবাঁকা
অশথ যেন মেলেছে প্রশাখা
পত্রপুঞ্জে আকাশ সঘন
কালের কালিমা-ব্যর্থ।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
তা' হ'তে দেবো না ব্যর্থ।

২

স্বপন-স্বর্গে ঘুরেছি অনেক
সারা দেহ-মনে স্বপনের লেখ,
স্বপন-সিক্ত স্নায়ু জটাজাল
স্বপন দিয়েছে শিক্ষা ;
অলীক মিথ্যা আলোকে বিলীন
সত্যটুকু যে চির-অ-মলিন,
আশার আসর হলো উত্তাল
তাইতো এই সমীক্ষা।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপনে পেয়েছি দীক্ষা।

৩

সব লেখা আছে ইতিহাসে, আর
লিখে গেছে কতো শত কথাকার,
বার বার তাই হাহাকার এতো
ক্ষুব্ধ হৃদয়-রথী ;
কৃত্তি-কবি ও মোহন-সাগর
মধু-বঙ্কিম-রবির আখর
কাজী শরতের জিজ্ঞাসা যতো
প্রশ্নের ভাগীরথী।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
সত্য-মোহনা-গতি।

৪

চুম্বক টানে লৌহচূর্ণ
করে নেয় তার ইচ্ছাপূর্ণ
গালভরা যতো বৃহতের বুলি
অট্টহাসির দাস ;
সে তো করে স্ব-কার্যসাধন
ইতিহাস ভাবে বিধির বাঁধন
ভস্মে পূর্ণ বাসনার ঝুলি
একটানা পরিহাস।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
সুপ্তি জাগরে ত্রাস।

৫

বাঁচবার দাবী লঘু বিদ্রূপে
বিচারের দাবী ছলনার যূপে
কতো কোটীবার দিয়েছে যে প্রাণ
কে তার হিসাব রাখে—
নানান বাহানা অসার যুক্তি
শতকে শতকে শতেক উক্তি

নিপাস করে যে গুঁড়িয়েছে মান
সে কথা বলবো কাকে ?
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
ডুবে আছি যেন পাঁকে !

৬

নিশার শেষের শিশিরের মতো
সবারে দিয়েছি যুগে যুগে কতো
ওরাতো কেবলি নিয়েছে এবং
আমায় করেছে রিক্ত ;
নিজ গৃহে আজ আমি ত কেহ না
দেহটাও যেন আমার দেহ না,
ক্লিন্ন-কুটিল বহুরূপী সঙ
যাদু-অবসানে তিক্ত !
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
অশ্রুধারায় সিক্ত।

৭

দমন পীড়ন শোষণ বন্দী
প্রমাদের সাথে করেছি সন্ধি
দীর্ঘায়িত হাজার বছর
কাল-গহ্বরে লুপ্ত ;
শাসকে শাসিতে অসম সখ্য
ভক্ষক রাখে জীইয়ে ভক্ষ্য
মুকুর-মুগ্ধ খুশীর বহর
আমায় রেখেছে সুপ্ত
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
রেখেছি গভীরে গুপ্ত।

৮

লুটেছে খনিজ, লুটেছে সবুজ
লুটেরা সবাই বোঝে সার বুঝ
বাদামী ও শ্বেত পীত পিঙ্গল
সবাই সমান গুণী ;
হে মোর চিত্ত, এ মোহ বৃত্ত
টুটে যাক, হোক প্রায়শ্চিত্ত
নিষ্ক্রিয়তায় মজে হলাহল
বিষাক্ত দিনগুণি।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
কালের আলাপ শুনি।

৯

শুভ্র স্বর্ণ বর্ণচ্ছটায়
কত না কিংবদন্তী রটায়,
পূর্বে দারুণ কঠিন সত্য
পশ্চিমে ফাঁদ বোনা ;
শুকিয়ে এসেছে ভ্রান্তি প্রপাত
ভুলগুলি যেন ভ্যাঙচায় দাঁত,
অভিজ্ঞতার অমোঘতত্ত্ব
সঞ্চিত কাঁচা সোনা।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপন আমার সোনা।

১০

যখনি দাঁড়াই সাগরের তীরে
সে আমারে বলে : চিনিস না কিরে ?
বলেই সে যেন কোথায় মিলায়
চেয়ে দেখি শুধু ঢেউ :—
সে ঢেউ আমার মজ্জার দেশে
ফিরে ফিরে আসে তুফানের বেশে

প্রলয়ের দূত বার্তা বিলায়
আমি কি তাহার কেউ ?
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
রক্তে মিশেছে ঢেউ।

১১

ফ্রাঙ্ক মার্ক্ আর পাউণ্ড ডলার
যন্ত্রতন্ত্র বিলায় ফলার,
ফ্লোরিন লিরা ক্রোনা.ও ইয়েন
কবলে ছোবল মারে,
হাজারী কিউবা হ্যানয় কঙ্গো
আরব ইহুদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ,
অাঁতেল বাতেল সাজায় ভিয়েন
সামলায় কে কাহারে।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
জানি কে মরে কে মারে।

১২

হিসাব নিকাশে ছিলাম অপটু
মধু নিয়ে ওরা দিয়েছে যা কটু,
সাগরে ডাঙায় হ'লো একাকার
হারিয়ে গিয়েছে তীর ;
জীবন নিয়ে কে সাজায় পসরা
জানি কে বানায় দাসের খসড়া,
অবাক হবার পালাটা এবার
বিপ্লব-বিলাসীর।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
' পাইনি স্বস্তি-নীড়।

১৩

দেখেছি কতনা ফিকির-ফন্দি
ছল-ছলনার নজরবন্দী,
তত্ত্ব তথ্য বহুবিচিত্র
যতো বাকী আছে বলো ;

ধ্যানের জ্ঞানের শতসমুদ্র
সেচনে দেখি যে স্বয়ং রুদ্র,
রঙে রঙে রাঙা ও মানচিত্র
কি করে তোমার হলো ?
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
কাটাকুটি হবে, চলো।

১৪

চাণক্যদল দেখছি ওড়ায়
শ্বেত নিশান পাড়ায় পাড়ায়,
বেওসার রথচক্রের তালে
শয়তান দেয় তালি ;
নিয়ত নিয়তি নিহত হবে যে
ভাবের ঘরটা ভরে না সহজে
শত প্রজন্ম শুষেছে বিশালে
দেহ মন তাই কাঙালী।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপন দেখেছে বাঙালী।

১৫

যুগ যুগ ধরে পাশব মিছিল
লালসা ক্রূরতা কুট-পিচ্ছিল,
সিংহিকার প্রেত যেন জিয়ন্ত
বিষ যে তাদের বিত্ত :
আমার অঙ্গনে আগাছার ভীড়
জীবন সুরের কেটে দেয় মীড়,
মালার আড়ালে কাঁটা-অনন্ত
কণ্ঠ করেছে ক্ষত।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
জাগবে ঈশান শত।

তপস্যা

১৬

এতো কাল ধরে কিঞ্চিদধিক
দেখেছি মরণ, জীবন-পথিক,
আকাল মারী ও বিষ-রাজনীতি
কত না করেছি গ্রাহ্য ;
ভয়-সওয়ার লাখো লাখো হবে
ত্রাসের চাবুক শিস দিক তবে
মূর্ত রাহুর আগ্রাসী ভীতি
চোরাবালি সাম্রাজ্য ।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপন বড়োই দাহ্য ।

১৭

প্রতারিত তাই প্রতিটি পলকে
লাঞ্ছনা-তাপ ঝলকে ঝলকে
পূর্ণ করেছে সকল শরণ
খরায় হৃদয় সারা ;
কখন কোথায় জ্বলে যে আগুন
আগুন আগুন আগুন !
ক্ষয় কি বা জয় এবারের পণ
চলুক যতোই পাহারা ।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
বক্ষ আমার সাহারা !

১৮

দূর শূন্যের সীমানার পারে
অযুত নিযুত সূর্য আগারে
অনাদি আলোক বিলায় সৃষ্টি

সে-সুদূর হতে আসে তরঙ্গ
মৃত্যুর দেশে জীয়ন রঙ্গ
আঁধারের বুক চিরিয়া দৃষ্টি
জীবন জোনাকিময়।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
জেনেছি আলোর জয়।

১৯

বন্ধ চোখের আলোর কিনারে
আমি কবি তাই মনের মিনারে
ভরসার সাজ আকীর্ণ করি
আশায় অনুত্তম ;
বেদ বাইবেল কোরাণ জাতক
আমার আকাশে সবাই চাতক
তৃষ্ণার তীরে তিলে তিলে মরি
জীবন যে অনুপম।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
হাজার লক্ষ ক্রম।

উপলব্ধি

২০

অন্তিম ক্ষণ আসে কি ঘনিয়ে ?
সৌর-ধ্বনির মধ্যমণি-এ
কর্ণ-সিন্ধু ওঠে কেঁপে কেঁপে
এ কার কাতর স্বর ?
যেন জারেজার উদগ্র মায়া
হৃদয়-মুকুরে ভাসে কার ছায়া
প্রত্যভিজ্ঞা দিগন্ত ব্যেপে
উত্তাল অন্তর !
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
দেখেছি নিরন্তর।

২১

এ ছায়ার মায়া অপ্রতিরোধ্য
স্বপনের ঋণ জীবনে শোধ্য,
কোথা কে বিধাতা – দেখাও সে-রূপ
ছায়া নয় শুধু—কায়া ;
গন্ধটা যেন খুব চেনা লাগে
পেয়েছি কখনো বহু বহু আগে,—
অলক্ষ্যে পোড়ে আন্তর-ধূপ
ছড়ায় যে তার মায়া।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
এবার দেখবো কায়া।

২২

কে ডাকে আমারে : "আয় আয় ফিরে,
আমার নিকটে দ্বিধা-ভয় কিরে ?
শত জনমের দুঃখ-যাতনা
মুছে দিতে পারি আমি।"
দশদিক হ'তে একই আহ্বান
উৎস যে তরে নাভি মূল থান ;—
প্রীতিহীন যতো ভীতির ফাৎনা
হবেই জাহান্নামী।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপন যে পরিণামী।

২৩

আলোর নাচন নিকটে আসে যে
অবশেষে আজ স্বরূপে ভাসে যে
যাহারে খুঁজেছি তাপে-অনুতাপে—
হৃদয়ে করেছে ভর ;

এতোদিন পরে শৃঙ্খলে টান
ঘূর্ণি হাওয়াও ঘনায়মান
অন্ধ-আঁধারী অশনি-বিলাপে
তা' হলে উঠবে ঝড় ;

হাজার বছর দেখেছি স্বপন
ওঠে ত উঠুক ঝড় !

মুক্তি

২৪

অনেক ভ্রমণ আর ভ্রম শেষে
নিঃস্ব রুগ্ন পঙ্গুর বেশে
ঘরে ফিরে দেখি : এ কি সঙ্কট
জননী সংজ্ঞাহীনা !—

এতো বেয়াকুপী কোথায় লুকাব
অশ্রুর স্রোত কি করে শুকাব,
ধিক্কারে যেন ধরণীর তট
ছিন্ন বিকল বীণা !

হাজার বছর দেখেছি স্বপন—
জননী জাগবে কি না।

২৫

এ ধূলির প্রতি কণায় কণায়
দীর্ঘশ্বাসের আর্তি ঘনায়
আমার ঊর্ধ্বপুরুষ যে তাই
কলিজায় লাগে দোলা ;—

আকুল মায়ের চরণ-চিহ্ন
সপ্ত-স্বর্গ চির-অভিন্ন
বিশ্ব-বিধানে মুক্তি যে চাই
মায়ের দুয়ার খোলা।

হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপন যায় না ভোলা।

২৬

বিশাল বিশ্বে হারিয়ে না যাই
নির্মূল করে আপদ-বালাই
তাইতো জননী রাক-টিপ দিয়ে
সাজিয়ে দিয়েছে আমারে :
সারা অন্তর এবার সজাগ
পথ-ঋত্বিক কালে কাটে দাগ,—
যা-কিছু পাওনা নেবো যে ছিনিয়ে
জীবন ফসল থামাবে।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
অলস-নিরাশা ভাঙাবে।

২৭

প্রবঞ্চনার মোহন চূড়ায়
ক্ষণিকের দীন শান্তি কুড়ায়
দিশেহারা আর দ্বন্দ্বমুখর
কতো না বন্ধুজন ;
হে বন্ধু! ফেরো, দৃষ্টি ফেরাও
আলোকে করুক কালোকে ঘেরাও,
বাড়াও তোমার তীর্ণ সুকর
মায়ের আমন্ত্রণ ;—
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
জীবন সমর্পণ।

২৮

মায়ের আঁচল শ্যামল-শোভন
প্রাণদা-সারদা-বরদা-প্রবণ
অফুরন্ত যে বিপুল বিভব
পলকে হাজার গ্রন্থ ;'

মানবে না বাঁধ কালের প্রবাহ
চিত্তে জ্বলে যে সৃষ্টির দাহ
মায়ের জীয়ন মহোৎসব
উপচার হোক অন্ত।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপন যে ফলবন্ত।

২৯
গয়া কাশী আর বৃন্দাবন
বদরী মক্কা বেথেলহেম
কে দেয় মুক্তি অকস্মাৎ ?
মুক্তি তো নয় পণ্য !
এ মাটি ঘর্ম অশ্রু নরম
আলোর তূণীর শিল্প পরম
ভাব-ধারণার বহে প্রপাত
জননী সুপ্রসন্ন।
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
দেখেছি বলেই ধন্য !

৩০
অসুর তনুর উৎস ধারায়
নিখিল নীলিমা নিজেরে হারায়
সসীম শিহরে অসীমের ত্রাণ
আমি দেবো তারে সঙ্গ ;
কাব্য-নাট্য-সুর সঙ্গীত
অমরত্বের অক্ষয় ভিত,—
তেজের বেগের প্রাণ-অফুরান
সে আমার মহাবঙ্গ ;
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপন অন্তরঙ্গ।

৩১

বঙ্গ ধর্ম বঙ্গ কর্ম
অঙ্গে মায়ের আশীষ বর্ম
প্রাণ বন্যায় এ মহাবঙ্গ
চির-আনন্দরাশি ;
যে যাহার পথে যাবেই যাক না।
আমারও পথটা ঋজুই থাক না,
ভাঙ্গে আর গড়ে কাল-তরঙ্গ
হাওয়ার আড়ালে হাসি !
হাজার বছর দেখেছি স্বপন
স্বপন হয় না বাসি।

২১শে জানুয়ারী—
২৩শে ফেব্রুয়ারী, '৮৩

নৃত্য

নর্তকীরা নাচে
ঘুরে ফিরে
ঘূর্ণায়মান মঞ্চে।
সারি সারি অজস্র চোখ হাঁ ক'রে থাকে
নির্বাক বিস্ময়ে : আহার জুটেছে ভালো।
চল্লিশোর্ধা নর্তকীদের কী রূপ দেখেছ ?
যদিও ভিটামিন খাওয়া—
কিন্তু তবু দেখো
যেন এক-একখানি মাখন মাখানো সজনের খাড়া ;
বসন্তের আগে
কার না লোভ হয় ব'লো ?

নর্তকীরা নাচে, যেন—
শান্ত সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের মাতামাতি, আর
মনুষ্যত্ব ভরা মাথাগুলো
ঘুরতে থাকে সামুদ্রিক হাওয়া।
কাঁপতে থাকে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে, আর
ভাবতে থাকে সৃষ্টি বিষয়ক সেই বিজ্ঞান

যে বিজ্ঞান—
প্রাণের পরম সত্যেরে
রেখেছে আড়াল ক'রে
সভ্যতার কোলে।

নর্তকীরা নাচে!
নৃত্যের ছন্দে ছন্দে
প্রাণের ব্যথা আর মনের কথাগুলিকে প্রকাশ করতে
মূক অঙ্গের কী দুঃস্বাভাবিক প্রয়াস!
মনে হয় বুঝি মূর্চ্ছা যাবে!
নর্ত্তকীরা নাচে
ঘুরে ফিরে
ঘূর্ণায়মান মঞ্চে।

প্রথম প্রকাশ
(বাতায়ন : ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৯)

চিত্ত ও জগৎ

ওখানে শ্মশান জ্বলে, অন্ধকরা অস্থিভস্মময়।
উত্তপ্ত বাতাসে ওড়ে পুঞ্জীকৃত নিস্প্রাণ আক্ষেপ!
অকল্যাণ আপনারে অবিশ্রান্ত করিছে নিক্ষেপ
রঙ্গনৃত্যে। যে-কোনো দুর্যোগ এসে হতবাক হয়
প্রক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গসম অতন্দ্র কর্মীরা নিশ্চেতন
শুদ্ধ আকাশের কোলে লুকিয়েছে বিবশ বিভূতি,
বর্বর করাল কাল শুনিবে না কাহারো কাকুতি,
বর্ধিষ্ণু পর্বতশিরে স্বস্তির দুর্লভ্য নিকেতন।

এখানে শ্মশান মৃত; সুরসিক সাহসী মানুষ
অপূর্ব অমৃতঙ্করা আচ্ছাদনে জাদুর কুটির—
স্থাপন করেছে সোজা অন্তরের গম্বুজ-চূড়ায়,
চিক্কণ দৃষ্টিতে দেখি কোথায় কে বিরহ কুড়ায়!
কোথায় সাগরতলে মৎস্যকন্যা মত্ত অধীর!
পর্বতের উচ্চতার কলা-মন্ত্র এখানে ফানুষ।

প্রথম প্রকাশ
(কবিতা, আষাঢ়, ১৩৫৪)

চৌমাথা

অনেক দুস্তর পথ হেঁটে এসে থেমেছি এখানে,—
চারদিকে চারপথ বিস্ময়ের বিভূতি-গভীর
অফুরন্ত ভবিষ্যৎ কৌতূহলে হয়েছে অধীর,
কোনদিকে যাই বলো?—পিছে সোজা বাঁয়ে না দক্ষিণে?
পিছনেতো পরিচিত ভাঙাপথ নূতনত্ব নাই
সোজা গেলে এই মতো দৈন্য ছাড়া আছে কিছু আর?
দক্ষিণে শাস্ত্রের মতে মঙ্গলের অনন্ত সম্ভার—
যে-মঙ্গল কবলিত হ'য়ে আজ নিজেরে হারাই।

শুনেছি শৈশবকালে বাঁয়ে থাকে যতো অকল্যাণ,
জরাময় আয়ুহীন অভাবিত নিরাশার দেশ।
এদিকে দুর্ভাগ্য আছে অফুরন্ত পর্বত-প্রমাণ
নিষ্ঠুর ভয়ের রাজ্য। এখনো এ অস্থিসার বুকে
অনেক সাহস আছে—আর আছে মৃত্যুর বিদ্বেষ,
তাই চলো বাঁয়ে যাই মোরা নির্ভয়ে শঙ্কার মুখে।

প্রথম প্রকাশ
(পরিচয়, পৌষ, ১৩৫৪)

শৈবাল

আমরা যে ঐতিহ্যের শেষ পাতা চাই ছিঁড়ে দিতে
আমরা যে নিষ্করুণ অতীতের কঠিন কাহিনী
চিরতরে মুছে দিতে অনুক্ষণ আছি ওৎ পেতে,
তোমরা কি ব্যর্থ করে দেবে তারে শৈবাল-বাহিনী!
গভীর জলের তলে অন্তহীন সুকোমল মাটি
মহামারী শঙ্কান্বিত ধর্মভীরু মনের মতন
সসম্মানে বুক পেতে ধরে আছে তোমাদের ঘাঁটি
তাই বুঝি বারংবার আমাদের ব্যর্থ আক্রমণ?

কোনদিন ধরো যদি কখনো সাগর হতে আসে
অকস্মাৎ, অভাবিত অনাত্মীয় দুর্ধর্ষ তুফান
নরম মাটির সাথে তা হলেতো চলে যাবে ভেসে!
শেষ হবে তোমাদের আলস্যের ক্লেদক্লিন্ন প্রাণ।
কতোদূরে সে সাগর?—দূরে নয়—আছে আশেপাশে,
এখানে ডাঙার পরে শিরায় শিরায় স্ফূর্তমান।

প্রথম প্রকাশ
(পরিচয়, পৌষ, ১৩৫৪)

শকুন

ঋতুরঙ্গ-বিবর্জিত মনে করো ছোট এক দেশ।
অথবা ঋতুরা আছে—আসে আর যায় নিয়মিত,
বিস্তারিত ঝোপঝাড় তৃণদল পায় নব বেশ,
অসংখ্য জঙ্গলী কীট গেয়ে চলে দুর্বোধ্য সঙ্গীত।
এ-হেন যে কোনো দেশ, পোড়ো মাঠ প্রাচীন প্রান্তর,
অথবা গভীর দীঘি যার নামে চারিদিকে ভয়;
সেখানে কোথাও আছে সঙ্গীহীন বয়স-জর্জর
মরা এক তালগাছ—প্রকৃতির ভয়াল বিস্ময়।

সেইখানে—সেই মরা গাছটির শুকনো মাথায়;
মৃতভোজী, সদাশিব শকুনের পুরাতন বাসা,
প্রভাতের সাথে সাথে বাসা ছেড়ে দূরে উড়ে যায়
যে-কোনো প্রাণীর কোনো পচা লাশ পাবে এই আশা।
নর, পশু, পাখি সব এর কাছে এক হয়ে যায়—
অনেক উঁচুর থেকে প্রভেদ কি দেখে ভাসা-ভাসা ?

প্রথম প্রকাশ
(বর্তমান, বৈশাখ ১৩৫৫)

পেশা

নারীর চোখের তলে নেই আর সাগরের ভার,
খোঁপা যদি খুলে যায়, কারো কিছু এসে যায় না তো,
এমনকি অঞ্চলের শৈথিল্যও ততটা বিখ্যাত
নেই আর, প্রকৃতির রহস্যের ভিড় নেই আর।
একদা যা ছিল দীর্ঘ সাধনার দুষ্প্রাপ্য সঞ্চয়,
সম্প্রতি যে-কোনো পণ্য, অন্য কোনো জিনিষেরই মতো
তারেই ছড়ানো দেখি যেখানে-সেখানে ইতস্তত;
সরল, প্রকট বিশ্বে নিঃশেষিত হয়েছে বিস্ময়।

তবু তো উদাস দিনে কিংবা কোনো বিষণ্ণ বিকালে
ধৈর্য ধরে তাল দিই কোনো দূর কূজিত কপোতে ;
সন্ধ্যার আকাশ আজো শুনি ভালো লাগে অনেকের
যদিও তখনি তারা অবহুল বসনের তলে
খোঁজে সেই অধীর অভ্যাসে, কিন্তু তারপর পথে
একা রাত্রি স্বপ্ন আনে। স্বপ্ন দেখা পেশা আমাদের।

প্রথম প্রকাশ
(কবিতা, আষাঢ়, ১৩৫৫)

দেশী খবর

মহকুমা হাকিমের তারবার্তা এসেছে সদরে :
সেখানে চালের দাম অগ্নিতুল্য—অর্থের সঙ্কট
ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয়রোগ প্রতি ঘরে-ঘরে
শনিবার হরতাল—জনসভা-ছাত্র ধর্মঘট।
সেকালের আই-সি-এস বিচক্ষণ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট
ব্রীজের টেবিলে বসে বিরক্তিতে পড়েন খবর ;
ইনিও যে নিরুপায় কী করেন—ভারে মাথা হেঁট—
প্রদেশ কেন্দ্রের কাছে চাইলেন জরুরী উত্তর।

মন্ত্রী আর উপমন্ত্রী সেক্রেটারী ব্যস্ত সকলেই
ওখানে সেনট্রাল থেকে কোনো এক উত্তম পুরুষ
এসেছেন গতকাল : বার্তাভুক করে গিশ্‌গিশ্‌
কনফারেন্স-রিসেপশান-গারল্যাণ্ড বেড়ে চলেছেই,—
নির্বিকার রামরাজ্য—ভবিতব্যে আবার পঞ্চুষ—
কেন্দ্রের জবাব আসে : "চাল নেই ?—পাঠাও পুলিশ।"

প্রথম প্রকাশ
(স্বাধীনতা, ৩রা আশ্বিন, ১৩৬০)

দমকা তুষ্টি

যখন ভাদ্রমাসে পূব আকাশে উঠছে ঝড়,—
মিদ্‌নাপুরে সাগর জুড়ে ডুবছে ঘর।
আবাদ করা সোনায় ভরা মোহন দেশ,
ধানের শীষে সাগর মিশে করলো শেষ !

চাষী তোর রক্ত গেলো ঘর ভাসালো আর ঠেকাতে পারবি না,
এখন কি খাবি আর কোথায় যাবি থাকলে গাঁয়ে বাঁচবি না।
কোলকাতা চল ধন্না দিবি দিল্লী সে তো অনেক দূর
দু' হাত পেতে ভিক্ষা নিবি টুকরো রুটি একটু গুড়।
স্বাধীন দেশের মানুষ বটে ভিক্ষাতে আর লজ্জা কি!
আকাশ ঘোড়ায় মন্ত্রী ছোটে ভিক্ষা ছাড়া ভরসা কি।
দিন দুপুরে পথের মোড়ে ছেলে ঘুমোয় খিদের ঘুম!
অবহেলায় জান মান যায় হাহাকারের কী মরশুম!
ওরে ও পাগলা বউ আগলা সহর গঞ্জে বেজায় চোর,
কেবল ফষ্টি-নষ্টি দম্‌কা তুষ্টি বউকে লোপাট করবে তোর।
বউ ছেলেকে সামনে রেখে কাঁদতে নেই,
গেছে রক্ত আছে হাড়তো হার মানতে নেই।
প্রবাদ বলে : দুঃখ এলে আসে ওরা দলবেঁধে,
তখন হাজার বুকে দ্বিগুণ রুখে আটকাতে হয় জাল ফেঁদে।
ধাপ্পা ধোঁকায় ফালতু কথায় নাচবি না,
ঝড়-তুফানে চোখ শুকালো মন শুকালে বাঁচবি না।

৩রা মে, ১৯৫৪

রুদ্রের মিছিল

দু'চার জাহাজ বিদ্যে বোঝাই
কতো গুণ তার লেখা-জোখা নাই
সাহিত্য বলো ইতিহাস আর দর্শন সব একাকার
ভাত-কাপড়ের প্রশ্নেই শুধু দিক্‌দিগন্ত অন্ধকার!
তাই দেখি যতো মধ্যবিত্ত
হাওয়া আর জলে জুড়ায় পিত্ত
মস্ত সহর কোলকাতায়,—
এ কাহিনী বেশী বললে আবার মানের দায়।
এখনো বোঝেনি
হালে নেই পানি,
চোখ কান বুজে ঘুরছে খুব,
ওদিকে দু'চোখ নাক মুখ ঠেলে দিচ্ছে ডুব।

পথে ঘাটে শুধু পাওনাদার
লোক জানাজানি নাজেহাল আর কেলেঙ্কার ;
কোথা শেষ এর ?—মনে মনে ভাবে যখন একা
বিধাতা পুরুষ ব-কলম নাকি ?—বরাত ফাঁকা !
এর চেয়ে ভালো দিন মজুর
প্রেস্টিজ নেই, পজিশন নেই, আশঙ্কা নেই কোনো জুজুর ;
গোটা সভ্যতা সামলায় ওরা কৌপিনে
বাবুদের বল চক্ষুলজ্জা গায়ের চামড়া ফিনফিনে ।
ইতিহাসখ্যাত চক্ষু লজ্জা
কেওরাতলায় বিছাবে শয্যা,
লক্ষ লোকের শুঁকবে ছাই
সহরে শকুনি ওড়ে না তাই ।
মুক্তি এ নয়
শুধু পরাজয়
গ্লানি আর অবহেলা,
বাঁচার প্রয়াসে দিনক্ষণ নেই : দিকশূল বারবেলা ।
তাই বলি ভাই,
ভেবে কাজ নাই
এইবার এসো উজান ভাঙি,
মনে মনে জমা যাত্রাপথের অনেক গানই ।
নরকগঙ্গা পাড়ি দিয়ে
আমরা যাবো ঢেউ মাড়িয়ে
সাত সকালে সমুদ্রে,—
দেখো দেখো দেখো, আমরা স্বয়ং রুদ্র যে ।

২৩শে জুন, ১৯৫৪

লাগাম

আশ্বিনের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা আকাশের দেশ
মাণিক্যের ছড়াছড়ি : যেন কোনো বয়স্ক মুঘল
ফাঁকি দিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি নয়ন যুগল
হারেম বানালো ফের—হুঁসিয়ার অমর আবেশ ।

দুর্লভ স্ফটিক দিয়ে বানিয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য শরীর
আমার কামনাগুলি এ-দূরত্ব মুছে দিতে চায় :
বহু খুঁজে পাই শেষে এই পথ—আকাশ যেথায়
ছুঁয়ে গেছে আমাদের ছোটো রেল—সহরতলীর।

এই পথে চলে যাবো মনে ভাবি রাত দ্বিপ্রহর
কোনো দিকে কেউ নেই—স্তব্ধ সব কী মুক্তির স্বাদ।
এমন পরম ক্ষণে পেছু থেকে শুনি কার স্বর—
মহামারী—মন্বন্তর—মহাজন করে আর্তনাদ!
পাথর টুকরোগুলি ম্রিয়মান—শিশির পোহায়
দূরে আসে ফার্স্ট ট্রেণ—ওদের হাজিরা পাঁচটায়।

প্রথম প্রকাশ
(ভাবীকাল, ৯ই আগষ্ট, ১৯৫৪)

জীবিকা

রাণাঘাট প্লাটফর্ম—দ্বিপ্রহর জমাট রেঁস্তোরা
দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত খুব—ঘেমেছি বেজায়
ট্রেণের অনেক দেরী—সেই বেলা সাড়ে তিনটায়
কিছুটা বিশ্রাম চলে—ডাকতেই আসলো বেয়ারা।
পরপর চার কাপ চা খেলাম সামনে পেপার
পাশে এক ভদ্রলোক বর্ষীয়ান সস্নেহে বলেন,—
অতো চা কি খায় বাবা—ক্ষতিকর, নিজেতো বোঝেন :
নিতান্ত লজ্জিত হই—কিছু আর থাকেনা বলার।

অনেক আলাপ হলো—উনি নাকি রিটায়ার্ড জজ
দেশের কী দুরবস্থা—ভবিষ্যৎ নিকষ পাষাণ!
শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেলো—বিদগ্ধ মগজ ;
ট্রেণের সময় তাই আমি উঠি—উনি চলে যান
ঠিকানাটা লিখে রাখি, ভেবে খুঁজি পকেটে কলম
সেফার্সটী অন্তর্হিত—সিদ্ধহস্তে হয়েছি জখম।

প্রথম প্রকাশ
(ভাবীকাল, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৫৪

প্রয়াস

যখন তোমারে ভাবি মনে হয় এ জগতে নেই
ভিজে চুল বেল ফুল বিকেলের অপূর্ণ পরশ,
কী গভীর আকর্ষণ, প্রেরণার তুমি বিশ্বকোষ,
যে-চোখে তোমারে দেখি তার জন্মমৃত্যু মুহূর্তেই।
তবু ও তো শতবার চোখ মেলি শতবার বুজি
কবিতার সখ আছে এতদিনে বুঝেছ নিশ্চয়,
তোমার দেনার কিছু এ সৃষ্টিতে যদি শোধ হয়:
দুঃসীম দুরাশায় তাই আমি শুধু মিল খুঁজি।

জীবন-নোঙর ফেলা হৃদয়ের হ্রদের তলায়
এইখানে পৃথিবী যে কী মধুর হয়েছি অবাক!
দূরের নক্ষত্র দেশে এ সুরের রেশ ভেসে যায়
শোন বন্ধু তাই বলি : মর দেহ পিছে পড়ে থাক্,
মুহূর্তের এ-আবেগে মহাকাব্য মূর্ত হ'তে পারে,
অথবা সন্তুষ্ট হ'বো প্রয়াসের দীপ্ত পুরস্কারে।

প্রথম প্রকাশ
(বিবর্তন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬২)

দীঘি

স্ফটিকের মায়া আছে, আর আছে অতল বিস্ময়
ঝড়ের প্রাবল্য আছে বয়সের বিনয় কঠিন
অফুরন্ত প্রাণময়, অহর্নিশ উত্তম রঙীন
তোমার পরশ পাই যখনই ছুঁয়েছি হৃদয়।

বিশ্বাসের শেষ নেই, বিন্দু বিন্দু অগাধ বিশ্বাস;
প্রাত্যহিক দাবীদার চারিপাশে অসংখ্য সবুজ
পলে পলে ধনক্ষয় দিনক্ষয় কামনা অবুঝ—
বারবার জনান্তিকে খুঁজে মরি ছিন্ন ইতিহাস।

প্রথম প্রকাশ
(প্রহরী, অগ্রহায়ণ-পৌষ : ১৩৬৩)

এ বসন্তে হে বসন্ত ব্যর্থ তুমি

যখন বসন্ত আসে ক'দিনেই বিশীর্ণা ধরণী
ফিরে পায় প্রাণশক্তি, হৃত-রূপ, স্বরের উচ্ছ্বাস
প্রবাসী দয়িত এসে ছুঁয়ে দিলে যেমন ঘরণী
তরুর তনুর তীরে আমি তার পেয়েছি আভাস।
কয়েকটি পৃথিবীর স্বপ্নে ঘেরা এই পৃথিবীকে
দেখি আর দেখি শুধু, অযুত নিযুত কোটিবার
নব হ'তে নবতর নবতম পলকে পলকে
যখন বসন্ত আসে সব দেখা দেখি একাকার।

সসীমের প্রয়োজনে অসীমের শাসন প্রখ্যাত,
এ বসন্ত কারো নয় কারো নয় সর্বত্র সবার,
সব জীব প্রাণী লভে জীবন্যাস, মানুষেরা শুধু
এ আশ্চর্য চরাচরে অত্যাশ্চর্য ফাল্গুনের মধু
পায়নাকো নির্বিশেষে : কী কুটিল কীর্তি সভ্যতার
এ বসন্তে হে বসন্ত ব্যর্থ তুমি ঘরে নেই ভাত!

প্রথম প্রকাশ
(দিনান্তিকা, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৬৩)

মজুর

প্রাসাদের কোন্ ছুঁয়ে যে সূর্য ওঠে প্রতিদিন
গভীর বাসনা নিয়ে দুই হাতে প্রণাম জানায়
মাঠ-কোঠা বসতির এইদিকে সপ্তরশ্মি ক্ষীণ
তাতেই প্রেরণা পায় আমাদের চৌধুরী মশায়।

দুই ছেলে দুই মেয়ে পরিবার মাঝারী সংসার
টিউশনী-খাতা-লেখা-ঘটকালী-দালালী ব্যবসা
কোনো মতে চলে যায়-মধ্যবিত্ত, দুবেলা আহার
অকস্মাৎ পক্ষাঘাত, তচ্‌নচ্‌ ঘর-বার-আশা!

ইস্কুল কলেজ তাই বন্ধ হ'লো ছেলেমেয়েদের
চাকুরী কল্পনা মাত্র ! দুই ছেলে ধাঁধার সরিক
সারাটা কপাল জুড়ে বিধাতার রূঢ় সাঙ্কেতিক ;
আহার্য দুঃস্বপ্ন যেন কলেবর কৃশ সকলের ।
হে ঈশ্বর রক্ষা করো, এইভাবে আর যে চলে না
মেয়ে দু'টি কাজ পেলো অফিসের ঠিকানা বলে না ।

প্রথম প্রকাশ
(কৃত্তিবাস, সারদ সংগ্রহ, ১৩৬৪)

বিংশ শতকের ভোজবাজী

মহানগরীর একটু দূরে
হুগলী ধরে শ্রীরামপুরে
আসবে কে কে
ডাকছে হেঁকে
দেখবে এসো মানুষ ভাই
একলা তো আর আস্তানাতে আস্থা নাই ।

দু'পাড় থেকে চিমনিগুলি
বকেই চলছে ময়লাবুলি
কয়লা পোড়ে
রক্ত ওড়ে
প্রাণের দায়—
নইলে বাবু কালের চাকা কে সামলায় !

পাটকলে আর তুলোর কলে ফলায় সোনা
হাজার গাঁয়ের লক্ষজনা
বিশ্রাম নাই ;
তবু সব এই শতকের মানুষ তাই
হপ্তা পায়
টায় টায় ।

নাকের জলে
চোখের জলে
হপ্তা পেলেই খরচ যতো,
খাঁ সাহেবের গরজ কতো
হাজির হয় যে ঠিক সময়,
রোদ-বাদলের লজ্জা হয়।

তারপর আছে সংসার
গুরু-দণ্ডিত মেরুদণ্ডের অহঙ্কার
চাল-ডাল আর তেল সাবান
বায়না-ধরা ছোট্ট ছেলের হাতী-ঘোড়া-ব্যোমযান।

কাঁচের চুড়ি রঙিন শাড়ী
মোটা ফিতের স্যাণ্ডেল
সারি সারি খুপরী ঘরে
সরু সুতোর ক্যাণ্ডেল।

কর্তারা সব আনায় ডলার
বানায় ফলার
শেঠজীরা সব ব্যাঙ্ক ফাঁপায়,
হায় রে হায়!
ভোজবাজী দেখে দিন-যামিনী
হয়রাণ শুধু হাড় ক'খানি।

গিন্নিরা সব সিন্নি মানে
শীতলা-কালী সব পাষাণে,
বলতে পারো
কঠিনতর
কোন সাধনায়
বরাত ফেরায়?

হপ্তা শেষে উড়ছে চুল
দিগ্বিদিকে সরষে ফুল,

ফন্দি করে লাক ফেরাবার সময় নাই
ভর-দুপুরে রান্নাঘরে বাসি ছাই
আফগান, ভাই, বাঁচাও জান
রাজধানীতে হিল্লে হলে শুধবো দেনা নাও সেলাম।

প্রথম প্রকাশ
(লোকসেবক, ১৯শে মে, ১৯৫৭)

এখনো কবিতা লিখি

এখনো কবিতা লেখো ?—
এক পুরনো বন্ধু বিস্ময়ে শুধালো।
বললাম : হ্যাঁ, লিখি, এই দেখো
হালফিলের কয়েকটি,—কেমন লাগলো ?
ব্যগ্রভাবে আমি শুধালাম।

দেখলাম — ।
বললে বন্ধুটি।
বিকেলের ধূলিমাখা সূর্যটি
ক্লান্ত-মলিন দু'একটি ঝিলিকে
বিদ্রূপ ছড়ালো ওর মুখ চোখে।
বললে : এই আধ-বুড়ো বয়সে,
যা দিনকাল ! সংসার চলে কত না আয়াসে,
তারপরও—?

হ্যাঁ, তারপরও,
বাধা দিয়ে বললাম : কাব্যচর্চার
সময় পাই ; জীবনটাই তো খরচার—
বর্ষ—মাস—যুগ-যুগান্ত,
তিলে তিলে শেষ করতেই প্রাণান্ত।
ক্ষিদেয় জ্বলে, বারুদে পুড়ে, প্রতি পলে আশাহত
জীবনের সারা গায় খরচের ক্ষত ;
তারই মাঝে দু'একটি মুহূর্ত
সাধ যায় ব্যয় করি, কল্পে তুলি মূর্ত ;—

এ সৃষ্টির অগোচরে
আমার স্নায়ুর চরাচরে
যতো কিছু জমে থাকে—বাঁধ ভাঙা অসহায়
আত্মহারা জলধির সংখ্যাহীন বুদ্বুদের প্রায়।

কবি-সত্তার সন্ধানে

কৈশোরের দু'চার সিঁড়ির পর ওপরের ঘরে
শুনেছি কাহার কণ্ঠ—আবেগ, উত্তাপ, শ্লেষ আর
জ্বালাময়ী প্রেরণার স্রোতস্বতী ; ভাঙে দুই পাড়,
রুদ্ধশ্বাসে উঠে গেছি, সাথে নিয়ে দীপ্ত যৌবনেরে।

দেখলাম সে তো নেই—ঘর একা, নির্বাক দেয়াল
রিক্ততায় ভরে গেছে সারা মন, ব্যথিত যৌবন ;
আরও ওপরে শুনি কার স্বর বহু পুরাতন,
আরো উঠে, আরো খুঁজি, দিশেহারা কাটে কতকাল।

কোথাও তো নেই সে যে : কী আশ্চর্য ! শুনি হাততালি।
দূরদর্শী মহাশূন্য আত্মহারা দিন গোনে কার,
হয়তো বা কিছু তার জানা আছে ; অশান্ত হৃদয়
মর্ত্ত্যবাসী আমরা যে বাসা বাঁধি—ভিৎ চোরাবলি,
স্বপ্নগুলি কী কুশলী, সব কিছু করে একাকার !
জমির জমাট মেঘে সব আলো তিলে তিলে ক্ষয়।

সাক্ষী

দাঁত ভেঙ্‌চে
রুখে দাঁড়ালো সে,
চকচকে ধারালো দুটো দাঁত
হিংস্রতার জলন্ত প্রপাত !

লোকটি আসছে লেঙচে
কতকগুলি হাড়
এলোপাথারি দুদ্দাড়—
কোনমতে জুড়ে-টুড়ে,
আগাছার মতো পাতাল ফুঁড়ে।

পরণে গামছার একটা ফালি
কানে আধপোড়া বিড়ির একটুখানি
দামী ভিটামিন ফুড্-এর
মরচে-ধরা কৌটো একটা হাতে।
চুলগুলি তার
প্রভাসের তৃণের মতই অসুদার।
দু'চোখে মিনতি :
চটিস কেন ভাই
তুইও খা, আমায়ও দু'টি দে ;
দে না,
আর যে পারি না!

খবরদার!—
ক্রোধে সে অন্ধ
হিংস্রতায় নেই কোন ছন্দ!
দাঁত নখ তৈরী, আর গজরায় সমানে
যার মানে :
এক পা এগিয়েছিস কি
জেনে যাবি জীবনের ফাঁকি,
মনে নেই সেদিন তাড়িয়েছিলি আমাকে
ঐ রকটা থেকে?

সে আমি নই ভাই।

তুই না হোস তোর বড়লোক ভাই।

কে কার ভাই রে
যে দেখে সে-ই না ভাই
একটু সরে দাঁড়া না।—
চোখে তার কান্না!

পাশবিক করুণায় কি না
কেউ জানে না।
ভেঙ্‌চে ভেঙ্‌চে অবশেষে
জায়গা দিলো সে।
লেঙ্‌চে লেঙ্‌চে লোকটি এলো;
ঈশ্বরকে তার পাওনা দিলো,
খুঁটে খুঁটে
পুরতে লাগলো মুখে,
বা, কৌটোয় কখনো
ছেলে-বৌ তার ও ফুটপাতে ধুঁকছে তখনো

সাক্ষী শুধু ডাষ্টবিনটা
সে কিছু বললো না—
ভাগ্যিস সে কথা বলে না।

কেউ কি দেখেছ

কেউ কি দেখেছ হাওয়া?
রাজা-অধিরাজ
তাইতো দরাজ
সারাটা বিশ্ব ছাওয়া।
কখনো শান্ত
কভু অশান্ত
ছুটোছুটি মিছামিছি;
বোশেখে তপ্ত
আষাঢ়ে রপ্ত
ভিজে গায়—এ কি, ছিঃ ছিঃ!

রাগে থর থর
যদি আসে ঝড়
ছোটে যেন ভূতে পাওয়া,
ঝড় শেষ হলে
অপরাধী বলে
শুধু তার দোষ গাওয়া।
শরতে মন্দ
খুশীর ছন্দ
সারা মন তার পূর্ণ ;
পৌষে কী হিম
আয়ু টিম টিম
সকল দন্ত চূর্ণ।
এলে বসন্ত
সাজে শ্রীমন্ত
বেশ এক বহুরূপী ;
কেউ দেখে নাই
তবু টের পাই
যাক না সে চুপিচুপি।
কেউ কি দেখেছে হাওয়া ?
বুক ভরপুর
ফুরালে ফতুর
শেষ হয় আসা-যাওয়া।

জীবন একটি গুহার মতন

জীবন একটি গুহার মতন
অন্ধ-করা আঁধারের এ-সাম্রাজ্যে
হাতড়ে ফিরি—কোথায় রতন
দ্যুতিময় সত্তা যার—অন্তরে কি বাজে ?

জীবন একটি গুহার মতন
প্রশ্ন আর রহস্যের ভিড়
শুরু থেকে শেষ চলে একটি স্বপন
নিশ্ছিদ্র এ-অন্ধকূপে নাই নাই আলোকের চির
জীবন একটি গুহার মতন
বিস্ময়-বিহ্বল কোনো চুম্বনের টানে
প্রবেশ-প্রশস্ত তার, নাই নির্গমন
বাঁচা শেষ হলে তার পাওয়া যায় মানে।

বাচ্চা পৃথিবীর সাচ্চা কাহিনী

এক যে আছে সাংবাদিক
নাম-ডাক তার দিগ্বিদিক।
ধনতন্ত্র গণতন্ত্র
সমাজতন্ত্র মহামন্ত্র
আরো যত টন্ত্র ফন্ত্র
সব করেছে আয়ত্ত ;

মালিক শ্রমিক সব সে চেনে
অন্ধকারে বেচে কেনে
টান দিলো কে গলায় চেন-এ
যায় বুঝি হায় স্বায়ত্ত !

দেশসেবা জনসেবা
কেন-ই বা
করে কে বা
কার এতো দায় ;
শতকরা নাকি ষাট
হেঁসেলের নেই পাট
ঢালো রাম আনো ভাট
হায়, হায়, হায়!

হরদম যায় ট্যুরে
বোয়িং মোয়িং-এ উড়ে
বুঁদ হয়ে দেখে ঘুরে
বাচ্চা পৃথিবীটা ;
মনে মনে কাঁদে সে যে
কলমটা নিলো কে যে
কি করে যে চিড়ে ভেজে
ঘোলাটে ছবিটা।
বর্ষ মাস রাত্র দিবা
পাকস্থলী কম্বুগ্রীবা
হেঁ হেঁ বাবা
এ ভীষণ মায়া
অষ্ট প্রহরে
মাথার উপরে
দুষ্ট ঈগল উড়ে
মগজে ফেলছে ছায়া।

মনে হয়

মনে হয় : খুব কিছু ভুল, বুঝি নি।
মনে হয় : ভুলে মশগুল নরজীবনী।

মনে হয় : জীবনের ভিতে ধরেছে ঘুণ।
মনে হয় : কারা অলক্ষিতে সাজায় তূণ।

মনে হয় : কীটনাশদার আসবেই।
মনে হয় : ঝাড়ু-বরদার সাজবেই।

নিহত নিয়তি

কোথাও কি কেউ এখনও নিরপেক্ষ,
কোনদিন কেউ ছিল কি কোথাও, বলো ?
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
শাস্ত্র বোঝাই শুধু হলাহল
মানুষের মনে নিষ্ঠুর এক লাগাম—
বিদ্রোহ কর—আভাস চাই যে আগাম।

কপাল আছে ত নেইকো বরাত
বিধিলিপিখানি ধূ ধূ করে স্রেফ,
ভাগ্যবানেরা টানছে করাত
নিরাশার ক্ষতে কে দেয় প্রলেপ ?
বেয়াকুপদল দেবেইত সুড়সুড়ি
নিহত নিয়তি আদ্যিকালের বুড়ী।

ছকে বাঁধা যতো পুরনো কোষ্ঠী
গুড়িয়ে উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেল
অনিশ্চিতের অমোঘ যষ্টি

সুনিশ্চিতের শাহানা মেল
উৎসব তাই উৎসব দশদিকে
রক্ত ব্যতীত আর সবই আজ ফিকে।

দেহে মনে আগুন মাখি

ফাঁকা তাক-এ
আগুন-টাগুন কে যে রাখে!
চমকে দেখি
একি, সে কী!
দিগ্বলয়ে
কি হ'লো এ!

হাওয়ায় উড়ে
ঘুরে-ঘুরে
লালচে ফাগুন
ঢালচে আগুন।

আসছে ফাগুন আসছে তেড়ে
এ আগুনে বাঁচবে কে রে?

তার চাইতে চলনা রে যাই
দেহে মনে আগুন মাখি
সত্যি কথা বল না রে ভাই
কোথায় এতো ফাগুন রাখি?

আগুন হয়ে গেলে কী আর
ফাগুনে ভয় থাকে?
হয় তো হবে সব জের বার
নজর রাখিস তাক-এ।

খরার দেশের গান

চলছে খরা আকাশ পাড়ায়
ক্ষেত খামারে তারই আদল
বক্ষে ক্ষুধা কলজে মাড়ায়
চক্ষে তাইতো ঝরছে বাদল।
শ্যেনদুষ্ট রাষ্ট্রনীতি
শঙ্কা ভয়ে কংল যে ভর
বাঁচবো বলেই বাঁধছি গীতি
ফেলবো গিলে দম, যম, ডর

অ নু বা দ

ভি. মায়াকোভস্কি-র
Aloud & Straight অবলম্বনে

একটি ঘোষণা

বন্ধুগণ!
হে নমদা নতুন মানুষ—
যে আঁধার একদা
মায়া আর মোহে আচ্ছন্ন করে
অদমতায় রেখেছিল ঘিরে
তোমরা তাকে সমান করে দিয়েছো।

জানতে কি চাইগো আমি কে?
কোন অধিকারে গাইছি প্রশস্তি?

বলি তবে শোন:
বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যামত পণ্ডিত নই কোন,
অন্তরের অজস্র জিজ্ঞাসাকে যারা
ভয় দিয় করে লক্ষ্যহারা;
আমি নই তাহাদের কেউ
নহি প্রশান্ত বারিকণা, আমি অশান্ত ঢেউ।

হে গর্বিত প্রাজ্ঞজন
রঙিন চশমাটা খুলে ফেলো;
আর শোন
তোমার কথা আমিই বলছি,
তুমি শুধু শোন।

অক্টোবরের সেই ডাকে যারা
কাব্যকলার ভুলভুলে
উদ্যানের মায়া ভুলে,
গিয়েছিল রণে,

অসমকে সমান করার কী বাসনা মনে,
আমি তাদেরই একজন
মনে শুধু রণ।

বিপ্লবোত্তর প্রথম দিনগুলি মনে পড়ে
শান্ত গৃহকোণ আর রূপডোরে
বিধৃত প্রকৃতি ;
অলীক কল্পনা আর পেছনের স্মৃতি
তখনও দিতো হাতছানি।
দুই যুগে হতো কানাকানি।

দিও, বলে দিও তাহাদের
থামাতে সে গান যাহা সত্য নয়
দেখেছি অনেক, ঢের ঢের।
ওদের ধারে কাছে কোথাও
পাবে না আমাকে খুঁজে।

পাবে না আমাকে খুঁজে গন্ধ-উধাও
শহরের গোলাপ-বাগিচার আশেপাশে।

পারি না কি ?—পারি।
নরম নরম প্রেমের কবিতা লেখা
এমন আর কি শক্ত।

লিখলে লিখতে পারি,
ওদের চাইতেও ভালো হতো সে লেখা—
যদি হতাম পুরাতনের ভক্ত।
কিন্তু না, পুরনো শেওলা হতে পারি না আমি
আমি যে সংগ্রামী।

সে কবিতা যদি কোনোদিন এসেই পড়ে কণ্ঠে
তবে তার অবশ্যই অপমৃত্যু ঘটবে
আর, আমিই ঘটাবো তার অপমৃত্যু।

শোনো, বন্ধুগণ!
কবিতা আমি লিখতে চাই ;
সংগ্রামী কাব্য, যার পেছনের টান নাই
মৃত্যুর মধ্যে দেখো তাতে জীবনের জয়গান
ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির ঐকতান।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কবিতা আমি লিখি
যার ছত্রে ছত্রে পাঠক পাবে জীয়নমন্ত্র।

আমার সে কাব্য ধ্বনিত হবে
শতাব্দীর সীমানা ছাড়িয়ে,
আর সব কবি আর শক্তির রাজত্ব মাড়িয়ে
আমি জানি আমার সে গান গীত হবে।
আমার কাব্যের সে যাত্রাপথ
কুসুমাস্তীর্ণ হবে না জানি!
অলস আর ইন্দ্রিয়পরের জন্যে আমি লিখবো না
সুখে দুঃখে আমার সে কাব্য
খুঁজে নেবে নিখাদ মানুষ ;
সমান মানুষ!
আমার সে কাব্য
পুস্তকের পৃষ্ঠা বন্দী হয়ে থেকেই মারা যাবে না,
কাহারও অলস মুহূর্তের ভোজ্য হবে না
সে যে হবে কঠিন অস্ত্র।
ক্ষুরধার বজ্র।

শুধু শুনতে ভাল লাগে
অথচ অর্থহীন ;
এমন মধুর কথা আমি বলতে পারি না
আমি বলবো না।

ওরা লিখতো
যা শুধু তরুণীদের লজ্জা বাড়াতো
ধোঁয়াটে আর অশ্লীল।
আর দেখো আমার কাব্য

পাতাগুলি ছিঁড়ে ফুঁড়ে যেন শতসহস্র সৈনিক।
রণবেশে এগিয়ে চলেছে।
ছোট ছোট কবিতাগুলি
যেন এক একটি মৃত্যুদূত—
জীবনের অমর বাহিনী,
আর দেখো বড়গুলি—
অফুরন্ত তূণ
লক্ষ্যভেদে অভ্রান্ত সবাই।

নানা জাতের কবিতার মধ্যে—
তারাই আমার সব চাইতে প্রিয়
যারা স্পষ্টভাবে সত্য কথা বলে
তীব্র, তীক্ষ্ণ, লঘুছন্দে চলে।
বিশ বছর লিখছি আমি
এমন কবিতা যারা সবাই সংগ্রামী।
প্রতি ছত্রে যার অস্ত্রের বলিষ্ঠতা—
তাদের প্রত্যেককে—
হে বিশ্বের সর্বহারা মানুষ
আমি তোমাদের দিয়ে গেলাম।

মেহনতী জনতার যারা শত্রু
তারা আমারও শত্রু নিশ্চয়
তাদের জন্যে আছে সীমাহীন ঘৃণার সঞ্চয়।
দারুণ দুঃখের দিনে
বছরের পর বছর,
লাল নিশানের তলে
আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম।
যেমন করে ঘরের জানালা খুলে দিয়ে
আমরা বাইরের আলো আনি,
তেমনি করে মার্কসের বই খুলে
আমরাও আলো পেয়েছিলাম।
সবকিছু ভালমত বুঝবার আগেও

একটু বুঝতে পেরেছিলাম—
কার হয়ে কার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।
হেগেলের কুটিল দ্বন্দ্ব
আমাদের পথ দেখায় নি
আমাদের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি
সহজ অস্ত্রের সন্ধান দিয়েছে
যা আমরা সরাসরি কর্তাদের ত্যাগ করে ছেড়েছি-
একদিন যেমন তারা আমাদের ত্যাগ করেছিল।
হে বিগত যৌবনা খ্যাতি
কাঁদো, আরো কাঁদো!
প্রতিভার শুকনো অপব্যবহার নয়;
এ যে অগ্নি-সংস্কার।
চোখ বোজো, হে আমার কাব্য
সৈনিকের মতো তুমিও নিঃশেষ হও
আমাদের মধ্যে থেকে
যেমন হাজার হাজার জানা-অজানা
সৈনিক প্রাণ দিয়েছে।
পুরস্কার চাই না আমি
চাই না স্মৃতির বিলাস, আমি যে সংগ্রামী।
আমরা সবাই সৈনিক, আমরা বন্ধু,
একই গৌরবের অংশ নেবো আমরা
আমাদের স্মারক হবে একই বেদী।
আর সে একাই বলবে আমাদের সবার কাহিনী
চিরকাল ধরে;
বলবে, কেমন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে
আমরা গড়েছি সমাজবাদ।
তোমরা যারা আগামী দিনের
মুক্ত হবে অবক্ষয়ের শ্যেনদৃষ্টি হতে
যাদের শরীর লৌহ-কঠিন
আর পেশীতে ইস্পাতের দৃঢ়তা—
আর বুঝতে পারবে

এক কবি গান গেয়েছিল সবার তরে।
দিন বর্ষ মাস আমাতেও মরচে ধরিয়ে দিচ্ছে
আমি যেন ইতিহাসের ধোঁয়া-চাপা
এক অতি দীর্ঘ-পুচ্ছ জীব।
এসো, হে বন্ধু জীবন—
পাঁচ-সালা ত্বরান্বিত করি।
কাব্য আমাকে কিছুই দেয় নি
না অর্থ, না আসবাব,
সত্যি বলছি বন্ধু —আমি চাইও না কিছু
শুধু চাই একটু পরিচ্ছন্ন জীবন।

ওটেন অবলম্বনে

সুভাষ-স্মরণে

দেশপ্রেমে উদ্দীপিত সুকঠিন শ সন তোমার
একদা কী সাজাটাই দিয়েছিলে আমারে সুভাষ,
মনে কিছু রাখি নাই: দেখিয়াছি অবাক বিস্ময়ে—
বীর বক্ষে রুখিয়াছ বিদেশীর প্রচণ্ড বিস্তার,
অসীমের বুক চিরে ধাবমান যেন আইক্যারাশ
মুক্তির উদাত্ত বাণী ঝঙ্কৃত যে নিখিল নিলয়ে,
তাহারি দিশারী তুমি, সীমাহীন দেশপ্রীতি আর,
কর্মের উদ্যমে তুমি আত্মহারা, কর্মই বিলাস।

এই বিশ্বে-মহাবিশ্বে দিকে দিকে শত্রু কম্পমান;
তাই বুঝি অকস্মাৎ নিয়তির ক্রুর তরবারে
ছিন্ন ভিন্ন বীর বক্ষ - স্তব্ধ হলো বিচূর্ণ হৃদয়।
সে চূর্ণ যে অগণন ইন্দ্রপ্রস্থ! স্বরাজের গান
সংখ্যাহীন সেনানীর বুকে বুকে দৃপ্ত হাতিয়ারে
ভারত জীয়ন বীর, হে সুভাষ! অমর নিশ্চয়।